ছোটদের আকাঈদ

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ.....৩
ঈমান (الايمان).....৪
ইসলাম (الاسلام).....১০
তাওহীদ ও শিরক.....১৭
ঈমান ভঙ্গের কারণ.....২৩
১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করাঃ.....২৯
২. আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ অস্বীকার বা অপছন্দ করা।..... ৩২
৩. আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ নিয়ে তামাশা করা।..... ৩৭
৪. কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা।৪০
সুন্নাত ও বিদয়াত.....৫৭

ভূমিকাঃ

আমাদের উপর আল্লাহ (ﷻ) সর্বশ্রেষ্ট যে নিয়ামত দান করেছেন তা হলো দ্বীন ইসলাম। ইসলাম হলো কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস ও বিধি বিধানের সমষ্টি। ইসলামের দুটি দিক রয়েছে ১. আক্বীদা-বিশ্বাস ও ২. আমল আখলাক। আমল আখলাকের তুলনায় আক্বীদা বিশ্বাসের গুরুত্ব অধিক। কেননা সঠিক আক্বীদা ছাড়া একজন ব্যক্তি তার ভাল আমলের পুরষ্কার লাভ করতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া আমলের ত্রুটির কারণে একজন ব্যক্তি পাপী হিসাবে গণ্য হয়। রোজ হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেও পারেন। কিন্তু আক্বীদা বিনষ্ট হলে একজন ব্যক্তির ঈমান ভঙ্গ হতে পারে ফলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। একারণে প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ ইসলামের সঠিক

আক্বীদা বিশ্বাস শিক্ষা করা যাতে ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেচে থাকা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে আমরা এখানে দলিল-প্রমাণসহ সংক্ষেপে ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। ওয়া মা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।

ঈমান (الايمان)

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহ (ﷻ) ও তার রসুল (ﷺ) কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলেছেন তার সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপণ করার নামই হলো ঈমান। হাদীস শরীফে এসেছে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أن تـؤمن بـالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

আল্লাহ, ফেরেস্তা, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রসুলগণ, আল্লাহর সাথে কিয়ামতের দিন সাক্ষাত, মৃত্যুর পরের জীবন এবং ভাল খারাপ সবই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তা স্বীকার করে নেওয়ার নামই হলো ঈমান। [সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসে ঈমানের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলোর বাইরেও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যাতে বিশ্বাস স্থাপণ না করলে একজন ব্যক্তি ঈমানদার হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, হালাম হারাম ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে অন্য একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،
ويؤمنوا بي، وبما جئت به

আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ না তারা স্বাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমার উপর আর আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করে। [সহীহ মুসিলম]

সুতরাং রসুলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেই সকল হুকুম আহকাম ও বর্ণনাসমূহের কোনো অংশ সম্পর্কে সামান্য পরিমান সন্দেহ পোষণকারী ঈমানদার হতে পারে না। যদি কেউ কুরআনের একটি শব্দ বা অক্ষরও অস্বীকার বা অপছন্দ করে তবে সে মুমিন নয়। উদাহরণস্বরুপ যদি কেউ মনে করে কুরআনে চোরের হাত কাটতে বলা হয়েছে, মেয়েদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে ছেলেদের তুলনায় কম দেওয়া হয়েছে এগুলো সঠিক

নয় তবে সে মুমিন থাকবে না। কাজি ইয়াদ বলেন,

وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه

যদি কেউ কুরআনকে বা কুরআনের একটি হরফকেও অস্বীকার ও অপছন্দ করে সে কাফির হবে। [আশ-শিফা]

একারণে ওলামায়ে কিরাম কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফির বলে থাকেন। যদিও তারা কুরআনের সকল বিষয়ে ঈমান রাখে। এমনকি তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে শ্রেষ্ঠ নবী মনে করে। কিন্তু তারা কুরআনের একটি আয়াতের একটি শব্দ না মানার কারণে তাদের কাফির বলা হয়। সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন (وخاتم النبيين)

“তিনি শেষ নবী”। কাদেয়ানী সম্প্রদায় এই কথাটি না মানার কারণে সমস্ত মুসলিমের নিকট বেঈমান হিসাবে পরিচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কাদেয়ানী সম্প্রদায়ের মতো যারাই কুরআনের কোনো একটি বিধান বা কোনো একটি নির্দেশকে অস্বীকার করে তাদের ঈমান অক্ষুণ্য থাকতে পারে না। যেহেতু ঈমান অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রাসুলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপণ করা। যারা কুরআনের কিছু বিষয় স্বীকার করে আর কিছু বিষয় অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ

الـدُّنْيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يُـرَدُّونَ إِلَـى أَشَـدِّ الْعَـذَابِ}
[البقرة: ৮৫]

তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? যে কেউ এমন করে তার শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করা হবে এবং আখিরাতে তাকে ভীষণ শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। [বাকরা/৮৫]

সুতরাং যারা নিজেদের মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়, নামায-রোজা করে, হজ্জ করে এমন লোকও যদি মনে করে চোরের হাত কাঁটা, বিবাহিত জেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করা ইত্যাদি আইন সঠিক নয় তবে সে বেঈমান হিসাবে গণ্য হবে এবং তার সকল ইবাদত নষ্ট হবে। যার ঈমান নেই তার

কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

আল্লাহ আমাদের ঈমানের উপর টিকে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ইসলাম (الاسلام)

ইসলাম শব্দটির অর্থ আত্মসমর্পণ করা। নিজের খেয়াল খুশিকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করার নামই হলো ইসলাম। আল্লাহর আদেশ মানতে যেয়ে যদি নিজের যাবতীয় সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করতে হয় তবু নিজের সুখ-শান্তিকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশের উপর টিকে থাকার নামই হলো ইসলাম। বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোক বলে

থাকে ইসলাম অর্থ শান্তি। তারা বলে যেহেতু সালাম (سلام) মানে শান্তি আর সালাম ও ইসলাম একই উৎস বা মাদ্দা হতে উদগত একারণে ইসলাম অর্থও শান্তি। যারা আরবী ভাষা সম্পর্কে খুব বেশি অবগত নয় তারা এসব কথা বলে থাকে। আরবী ভাষাতে একই মাদ্দা বা উৎস হতে বের হলেও একটি মূল শব্দ বিভিন্ন গঠনে বিভিন্ন রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণসরুপ, হেদায়েত (هداية), হাদিয়া (هدية) ও হাদী (هدي) শব্দ গুলো একই মাদ্দা (ه – د - ي) হতে নির্গত কিন্তু এগুলোর অর্থ বিভিন্ন। হেদায়েত অর্থ পথ দেখানো, হাদিয়া অর্থ উপহার দেওয়া আর হাদী অর্থ কুরবানীর পশু। একইভাবে কালামুন (كلام) ও কালমুন (كلم) শব্দ দুটি

একই মাদ্দা (ك – ل - م) হতে নির্গত কিন্তু দুটি শব্দের অর্থ দুরকম। কালামুন অর্থ কথা আর কালমুন অর্থ জখম হওয়া। এধরণের বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। সালাম ও ইসলাম শব্দদুটির ব্যাপারেও একই কথা। শব্দদুটি একই উৎস বা মাদ্দা হতে উদগত। কিন্তু এদের অর্থ বিভিন্ন। সালাম অর্থ শান্তি আর ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা।

প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান মু'জামুল ওয়াসীতে ইসলাম শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إظهار الخضوع و القبول لما أتى به محمد و الدين الذي جاء به محمد

ইসলাম হলো, নত হওয়া এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) যা কিছু নির্দেশ নিয়ে এসেছেন সেগুলো

মেনে নেওয়া আর তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করে নেওয়া।

সুতরাং আল্লাহর উদ্দেশ্যে নত হওয়া ও তার বিধি-বিধান মেনে নেওয়াটাই হলো ইসলাম। যারা বলেন ইসলাম অর্থ শান্তি তাদের বিভিন্ন রকম চক্রান্ত রয়েছে। এরা আসলে চায় মানুষ দুনিয়াতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করুক। উদাহরণস্বরুপ যদি কোনো নাস্তিক ইসলাম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে এবং মুসলিমরা তার প্রতিবাদ করে এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে আর এ বিষয়ে কিছু হৈ চৈ সৃষ্টি হয় তখন এরা বলে ইসলাম শান্তির ধর্ম, এধরণের অশান্তি সৃষ্টি করা ঠিক নয়। কিন্তু আল্লাহ (ﷻ) আমাদের ভিন্ন চিন্তাধারা শিক্ষা দেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন সর্বাবস্থায় তার বিধান মেনে

চলতে যদিও তাতে কেউ অপছন্দ করে এবং একারণে হৈ চৈ সৃষ্টি হয়। একইভাবে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় কুফর-শিরক, হারাম ও অশ্লীল কাজের প্রতিবাদ করতে, এগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে যদিও এতে অনেক সময় সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। যুগে যুগে নবী রাসুলরা একাজই করেছেন। তারা মানুষকে কুফর-শিরক হতে ঈমানের রাস্তায় আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাদের এ ধরণের প্রচেষ্টার ফলে কাফির-মুশরিকরা তাদের উপর একযোগে ঝাপিয়ে পড়েছে, তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এর ফলস্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক গোলোযোগ ও বিশৃঙ্খলা। এ বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য নবী রাসুলরা কিন্তু হক কথা বলা পরিত্যাগ করেন নি বা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো আপোস করেন নি। তদের জীবন থেকে আমাদের

শিক্ষা নিতে হবে। সর্বদা সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের কিছু অংশ পরিত্যাগ করা বা আপোস করা মুসলিমের কাজ নয় বরং নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলাই তার কাজ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ

দূরে হক কাছে হক আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করো আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরষ্কার কে ভয় করে না। [ইবনে মাযা]

বর্তমানে দেখা যায় ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা বললেই নাস্তিক মুরতাদরা হৈ চৈ শুরু করে দেয়। পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার করা হলে বিশ্বের বড়-বড় কাফিররা তার প্রতিবাদে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক

অজ্ঞ লোক বলে এতো প্রতিবাদ ও হৈ চৈ সৃষ্টি না করাই ভাল। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে এসকল বিধান দ্বারা এখন বিচার না করাই উচিৎ। আমাদের স্পষ্ট জেনে নিতে হবে যে, এই ধরণের শান্তি যারা প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের কিয়ামতের দিন চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে। এই ধরণের শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো মূল্য নেই। আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে এবং কাফিরদের সন্তুষ্ট করে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয় তা আসলে শান্তি নয় বরং চরম অশান্তি যদিও বেশিরভাগ লোক তা বুঝতে সক্ষম নয়।

মোট কথা মুসলিম হিসাবে আমরা সকল প্রকার হৈ চৈ চেচামেচিকে উপেক্ষা করে আখিরাতে জান্নাত লাভ করার জন্য দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে যে কোনো

অবস্থায় ও যে কোনো মূল্যে আল্লাহর বিধান মেনে চলবো ইন-শাআল্লাহ্।

তাওহীদ ও শিরক

তাওহীদ (التوحيد) অর্থ একত্ববাদ। কোনো কিছুকে এক বলে ঘোষণা করার নামই হলো তাওহীদ। মহান আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে মেনে নেওয়া এবং একমাত্র তারই ইবাদত করাকে তাওহীদ বলে। অন্য কথায়, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং সারা জীবন একমাত্র তার দ্বীন ইসলাম মেনে চলার অর্থই হলো তাওহীদের উপর টিকে থাকা। যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর টিকে থাকে তাকে মুমিন বা মুসলিম বলা হয়। তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক

ও কুফর। শিরক (الشرك) অর্থ অংশী সাব্যস্ত করা। আল্লাহর ক্ষমতায় কাউকে অংশ দেওয়া বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করাকে শিরক বলা হয়। আর কুফর অর্থ অস্বীকার করা। আল্লাহর অস্তিত্ব রসুলুলের রেসালত এবং কুরআন হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমানিত যে কোনো বিষয় অস্বীকার করাকে কুফরী বলা হয়। অন্যান্য পাপের চেয়ে শিরক-কুফরের ভয়াবহতা অধিক। শিরক-কুফরের বেশ কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে যেমন,

ক) শিরক-কুফর পাপ সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]

শিরক হচ্ছে ভয়াবহ পাপ। [লুকমান/১৩]

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ}

তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে বা সত্য সমাগত হওয়ার পরও তা অস্বীকার করে! জাহান্নামই কি কাফিরদের বাসস্থল নয়! [ঝুমার/৩২]

খ) শিরক-কুফর অন্য সকল নেক কাজকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}

যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে তার আমল বিনষ্ট হয়। [মায়েদা/১০৭]

এছাড়া সূরা আনয়ামে বিভিন্ন নবীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

{ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

যদি তারা শিরক করতো তবে তাদের সকল আমল বিনষ্ট হতো। [আনয়াম/৮৮]

গ) শিরক-কুফরের গোনা কখনও ক্ষমা হয় না। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শিরক করার গোনা ক্ষমা করেন না এ ছাড়া অন্য যে কোনো গোনা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন। [সূরা নিসা/৪৮,১১৬]

ঘ) শিরক-কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং সে চিরোকাল জাহান্নামবাসী হবে। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [المائدة: ٧٢]

নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তার উপর জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং তার স্থান হয় জাহান্নাম। [মায়েদা/৭২]

আল্লাহ আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} [البينة: ٦]

নিশ্চয় আহলে কিতাবী কাফিররা বা মুশরিকরা চিরোকাল জাহান্নামে থাকবে তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি। [বায়্যিনাহ্/৬]

মোট কথা একজন তাওহীদবাদী মুসলিম যদি শিরক-কুফরে লিপ্ত না হয় তবে সে অন্য যে পাপেই লিপ্ত হোক তাতে তার

চিরোস্থায়ী শাস্তি হবে না। হয়তো আল্লাহ তার পাপ পুরোপুরি ক্ষমা করে দেবেন অথবা তার পাপের কারণে কিছুকাল জাহান্নামে রাখার পর তাকে পুনরায় জাহান্নাম হতে মুক্তি দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু কোন ভাবেই তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করবেন না। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

তাওহীদপন্থী কিছু লোককে (পাপের কারণে) জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে এমনকি তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে এর পর আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। [তিরমিযী]

সুতরাং একজন মুমিনের উচিৎ নিজের ঈমানকে রক্ষা করে তাওহীদের উপর টিকে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং এমন কোনো কাজ না করা যাতে ঈমান ভঙ্গ হয় এবং তাওহীদ বিনষ্ট হয়। এজন্য আমাদের জানতে হবে কোন কাজ করলে ঈমান ভঙ্গ হয়। নিচের অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ভঙ্গের কারণ

আমাদের সমাজের অনেক মানুষ মনে করে মুসলমানের ঘরে যে জন্মেছে বা মুখে কালিমা পাঠ করে মুসলিম হয়েছে এমন ব্যক্তি অন্য যে কাজই করুক তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কোনো অবস্থাতেই তাকে কাফির-মুশরিক বলা যাবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

হে ঈমানদাররা তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আলে ইমরান/১০২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) ইব্রাহীম ($) ও ইয়াকুব ($) সম্পর্কে বলেন তারা তাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

হে আমার সন্তানরা আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন মনোনিত করেছেন অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [বাকারা/১৩২]

সুতরাং আল্লাহ সকল ঈমানদারদের সতর্ক করে বলছেন মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। এমনকি ইব্রাহীম (\$) ও ইয়াকুব (\$) নিজ নিজ বংশধরদের ডেকে একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। এতে প্রমানিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি মুসিলম থাকার পর কোনো কারণে কাফির হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ বর্তমানে মুসলিম আছে এর অর্থ এই নয় যে, সে যে কাজই করুক চিরকাল মুসলিম থাকবে। এমন প্রচুর কথা বা কাজ রয়েছে যেগুলো করলে বা বললে একজন মুসলিম কাফির হয়ে যায়। ঐ সকল কথা বা কাজকে নাওয়াকিদুল ঈমান (نواقض الايمان) বলা হয়। যেভাবে ওযু ভঙ্গের কিছু কারণ আছে যেগুলোকে নওয়াকিদুল উদু (نواقض

الوضوء) বলা হয়। যে ব্যক্তি একটু পূর্বে ওযু করে এসেছে এবং তার হাত-পা ও মুখমন্ডল ভিজা রয়েছে ওযু ভঙ্গের কোনো কারণ ঘটলে তার ওযুও ভেঙে গেছে বলে গণ্য হবে। যদি কেউ ওযু ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত না জানে তবে সে হয়তো বলবে, এই ব্যক্তির গাঁ, হাত-পা ভিজা থাকার পরও তার ওযু কিভাবে ভঙ্গ হতে পারে? বর্তমানেও একই সমস্য দেখা যায়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা নামায-রোজার পাবন্দি করেন, মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেন, দাড়ি রাখেন, গায়ে জোব্বা ও মাথায় পাগড়ি পরিধান করেন। কিন্তু এমন কিছু কথা বলেন বা একন কিছু কাজে লিপ্ত হন যাতে ঈমান ভঙ্গ হয়। যারা ঈমান ভঙ্গের

কারণ সম্পর্কে জানে না তারা বলে, এই ব্যক্তিকে কিভাবে কাফির-মুশরিক বলা যেতে পারে অথচ সে মুসলমানের ঘরে জন্মেছে, কালেমা পড়ে, নামায পড়ে। একারণে আমাদের ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন যাতে করে এধরণের সমস্যায় পড়তে না হয়।

পূর্ববর্তী ওলমায়ে কিরাম তার গ্রন্থাবলীতে ঈমান ভঙ্গের বহু সংখ্যক কারণ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থের মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীর বিধান সম্পর্কিত আলোচনাতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেসব কথা ও কাজের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কাফিরে

পরিনত হয় তা মূলত ৪ টি উৎস হতে উৎসরিত।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা।

২. আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ অস্বীকার বা অপছন্দ করা।

৩. আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ নিয়ে তামাশা করা।

৪. কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা।

নিম্নে উপরোক্ত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করাঃ

ইমাম নাব্বী বরেন,

أَمَّا الْعِبَادَةُ فَهِيَ الطَّاعَةُ مَعَ خُضُوعٍ

ইবাদত হলো বিনম্রতার সাথে কারো আনুগত্য করা। [শারহে মুসলিম]

প্রখ্যাত আরবী অভিধান লিসানুল আরবে বলা হয়েছে,

وأَصل العُبودِيَّة الخُضوع والتذلُّل

ইবাদতের মূল অর্থ হলো বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া।

মোট কথা শাব্দিক অর্থে কাউকে অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করা ও তার উদ্দেশ্যে অতিমাত্রায় বিনয় প্রকাশ করাকেই ইবাদত বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় কোনো অদৃশ্য শক্তির নিকট কাকুতি মিনতি করে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করাই ইবাদত। এই ধরণের অতিপ্রকৃতিক শক্তির সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তাও ইবাদত বা উপাসনা হিসাবে গণ্য। অদৃশ্য সত্ত্বা বা অদৃশ্য শক্তির নিকট প্রার্থনা বলতে দুরকম প্রার্থন বোঝায়।

ক. অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থণা। যেমন বিপদে পড়ে বহু দূরে অবস্থিত পীরকে সাহায্যের জন্য ডাকা শিরক বলে গণ্য হবে যেহেতু এতে পীরকে গায়েবের উপর কর্তৃত্বশীল মনে করা হয়। এক্ষেত্রে নিকটে অবস্থিত কাউকে আহ্বান করলে শিরক হতো না।

খ. কোনো জীবত-মৃত উপস্থিত অনুপস্থিত যে কারো নিকট এমন কিছু প্রার্থণা করা যা কেবল আল্লাহর অধীকারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যা দিতে সক্ষম নয়। যেমন পীরের নিকট সন্তান, বৃষ্টি, ব্যায়সায় আয়-উন্নতি ইত্যাদি প্রার্থনা করা।

ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন,

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات : فهو كافر بإجماع المسلمين

যদি কেউ ফেরেস্তা বা নবীদের মাধ্যম মনে করে তাদের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের উপর ভরষা করে, তাদের নিকট উপকারী

বিষয় কামণা করে ও ক্ষতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যেমন তাদের নিকট পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা, করে, হিদায়েত প্রার্থনা করে, বিপদ আপদ থেকে মুক্তির চাই তবে মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

2. আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ অস্বীকার বা অপছন্দ করা।

আরবীতে ইনকার শব্দের অর্থ হলো, অস্বীকার বা অপছন্দ করা। আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ ইনকার করা তথা অস্বীকার বা অপছন্দ করা স্পষ্ট কুফরী হিসাবে গণ্য। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ৬৫]

হে নবী আপনার রবের কসম তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সংঘটিত যে কোনো সমস্যার বিচারভার আপনার উপর অর্পণ করে এরপর আপনি যে বিচারই করবেন সেটা মেনে নিতে তাদের অন্তরে সামান্যও কষ্ট না হয় বরং পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়। [নিসা/৬৫]

সুতরাং আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে যা কিছু বলেছেন বা রসুলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করেছেন যদি সেগুলোর কোনো কিছু সম্পর্কে কারো অন্তরে সামান্য পরিমান সন্দেহ বা আপত্তি অভিযোগ থাকে তবে সে মুমিন বলে গণ্য হবে না বরং কাফির হয়ে যাবে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،
ويؤمنوا بي، وبما جئت به

আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ না তারা স্বাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমার উপর আর আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করে। [সহীহ মুসিলম]

ইমাম বায়দাবী বলেন,

وفي الشرع : إنكار ما علم بالضرورة مجيئ الرسول
صلى الله عليه و سلم به

শরীয়তের পরিভাষায় কুফরী বলতে বোঝায় রসুলুল্লাহ (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে স্পষ্ট জানা গেছে তা অস্বীকার করা। [তাফসীরে বায়দাবী]

কাজি ইয়াদ বলেন,

وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه

যদি কেউ কুরআনকে বা কুরআনের একটি হরফকেও অস্বীকার ও অপছন্দ করে সে কাফির হবে। [আশ-শিফা]

বর্তমানে যারা ইসলামের বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে কটাক্ষ করে সেগুলোকে মধ্যযুগীয় বর্বর আইন হিসাবে আখ্যায়িত করে এরা যতই নামায-রোজা করুক স্পষ্ট কাফির হিসাবে গণ্য হবে।

যারা বলে, চোরের হাত কাটা, জেনাকারীকে বেত্রাঘাত করা বা রজম করা সঠিক বিধান নয়। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানকে কম দেওয়া যৌক্তিক নয়। সাথে সাথেই তারা কাফির হিসাবে গণ্য হবে। একইভাবে বর্তমানে যারা মনে করে

বাল্যবিবাহ অমানবিক ও কুরুচিকর কাজ তারা কাফির হবে যেহেতু স্বয়ং রসুলুল্লাহ (ﷺ) হযরত আয়েশাকে ৭ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন তাছাড়া কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } [الطلاق: 4]

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েজ হয়নি .... [ত্বলাক/৪]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, হায়েজ হয়নি এমন মেয়েও কারো স্ত্রী হতে পারে। সুতরাং আল-কুরআনে প্রমানিত এবং রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনে সংঘঠিত একটি বিধানকে আইনের মাধ্যমে অবৈধ ঘোষণা করা এবং সেটার বিপরীতে প্রচার প্রসার চালানো স্পষ্ট কুফরী। আসলে মুসলিম তরুন-তরুনীদের চরিত্রহীন করার লালসে শয়তানের দোসররা

এসব প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে থাকে। ইসলামের যে কোনো বিধানকে বাতিল প্রমানিত করার প্রচেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মহল কাফির হিসাবে গণ্য হবে।

3. আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ নিয়ে তামাশা করা।

আল্লাহ, আখিরাত, রসুল-রেসালাত, এবং ইসলামের যে কোনো বিষয় নিয়ে তামাশা করা স্পষ্ট কুফরী হিসাবে গণ্য। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

আপনি বলুন তোমারা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং তার রসূলকে নিয়ে তামাশা

করছিলে? তোমারা কোনো ওযর পেশ করো না তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো। [সূরা তাওবা/৬৬]

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কুটুক্তি করে তবে ঐ সকল বড় বড় কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো। [তাওবা/১২]

এই সকল দলিল প্রমাণের উপর নির্ভর করে ওলামায়ে কিরামের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো,

والاستهزاء بشئ من الشرائع كفر

যে কোনো দ্বীনী বিষয় নিয়ে তামাশা করা কুফরী। [দুররুল মুখতার]

ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া ও মোল্লা আলী কারীর শারহে ফিকহে আকবারে বর্ণিত

আছে, ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন সর্বোচ্চ কাজি ছিলেন তখন একবার তার মজলিসে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) লাউ খেতে পছন্দ করেন। এ কথা শুনে একজন ব্যক্তি বলে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করি না। আবু ইউসুফ (রঃ) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমাকে তরবারী দাও। অবস্থা বেগতিক দেখে লোকটি তওবা করে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শানে বেয়াদবী করার কারণে ইমাম আবু ইউসুফ লোকটিকে মুরতাদ হিসাবে মৃত্যুদন্ড দিতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখি মুসলিম নামধারী শাসকরা ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নিয়ে তামাশা-তাচ্ছিল্ল করে থাকে। ইসলামের আইন-কানুনকে মধ্যযুগীয় আইন বা বর্বর আইন ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে।

যারা ইসলামী আইন চাই তাদের উদ্দেশ্যে এসব শয়তানদের দোসররা বলে থাকে এরা তো মধ্যযুগীয় বর্বর আইন চায়। এধরনের একটি কথায় একজন মুসলিমকে কাফিরে পরিনত করার জন্য যথেষ্ট।

4. কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

তবে কুফরীর প্রতি যার অন্তর প্রসস্ত হয় (সন্তোষ চিত্তে কুফরীকে মেনে নেয়) তার উপর আল্লাহর গজব এবং ভীষণ শাস্তি। [সূলা নাহল/১০৬

ওলামায়ে দ্বীনের নিকট একটি সর্ব স্বীকৃত মূলনীতি হলো,

الرضي بالكفر كفر

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফরী।

[তাফসীরে কুরতুবী ও অন্যান্য]

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা বলতে বেশ কিছু বিষয়কে বোঝায়। যেমন,

ক) যদি কোনো মুসলিম কেবল মাত্র মুখে কুফরী কথা বলে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না করে তবু সে কাফির হবে। কেননা স্বেচ্ছায় মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করায় কুফরী উক্ত কথা সে অন্তরে বিশ্বাস করুক বা না করুক।

মোল্লাহ আলী ক্বারী (রঃ) হাবীল ফাতাওয়া থেকে উল্লেখ করেন,

من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر

যে কেউ মুখে কুফরী কথা বলে যদি তার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান থাকে তবু সে আল্লাহর নিকট কাফির হিসাবেই গণ্য হবে। [শারহে ফিকহে আকবার/২৪৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَالرَّجُلُ لَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِمَصَالِحِ دُنْيَاهُ مِنْ غَيْرِ حَقِيقَةِ اعْتِقَادٍ صَحَّ كُفْرُهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا

কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়াবী স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে মুখে কুফরী কথা বলে কিন্তু সে প্রকৃতই সে বিশ্বাস রাখে না তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সে কুফরী করেছে বলেই গণ্য হবে। [ফাওয়ায়ে কুবরা]

সুতরাং যদি কোনো নেতা হিন্দুদের সন্তুষ্ট করে ভোট অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো কারণে মুখে বলে "দূর্গা মার কারণে এবার

আমরা বেশি ফসল পেয়েছি''। এই ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হবে যদিও সে দাবী করে তার অন্তরে এই বিশ্বাস নেই সে এটা কেবল মুখ রক্ষার জন্য বলেছে। কেননা কুফরী কথা মুখে বলায় কুফরী তার অন্তরের উদ্দেশ্য কি সেটা লক্ষ করা হবে না।

একইভাবে মানসুরে হাল্লাজ নামে এক ব্যক্তি বলেছিল আনাল হক (انا الحق) ''অর্থাৎ আমিই আল্লাহ'' একারণে তার সময়কার সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে তাকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন এবং তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছেন। ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন,

وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته. وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا

বাগদাদের ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে মানসুরে হাল্লাজ কাফির ও যিনদিক। তারা তাকে হত্যা করা ও শুলে চড়ানোর ব্যাপারে ইজমা [১] করেছেন। আর তৎসময়ে বাগদাদের আলেমরা সারা পৃথিবী বলে গণ্য হতেন। [বিদায়া ওয়ান নিহাইয়া]

বর্তমান সময়ে অনেকে এই কাফিরের পক্ষ নিয়ে বলে তিনি মুখে এমন বাক্য উচ্চারণ করলেও তার অন্তরে মূলত ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। এদের এই অজুহাত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত যেহেতু আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুফরী কথা স্বেচ্ছায় মুখে উচ্চারণ করাই কুফরী অন্তরে বিশ্বাস রাখা হচ্ছে কিনা তা লক্ষ করা হবে না।

---

[১] ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতকে ইজমা (اجماع) বলা হয়।

খ) ভবিষ্যতে কুফরী কাজ করার সংকল্প করা, নিজেকে কাফির বলে পরিচয় দেওয়া বা কাফির হওয়ার আশা প্রকাশ করাও কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ বলে গণ্য। যে ব্যক্তি এমন করে সে কাফির হবে।

যদি কোনো মুসলিম তামাশার ছলে বলে বলে "আমি হিন্দু" বা "আমি খৃষ্টান" তবে সে কাফির হবে। এ বিষয়ে ফিকাহর কিতাবে কঠিন ফতোয়া বর্ণিত আছে। হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وَبِقَوْلِهِ لَبَّيْكَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ يَا كَافِرُ يَا يَهُودِيُّ يَا مَجُوسِيُّ وَبِقَوْلِهِ أَنَا مُلْحِدٌ

যদি কেউ কাউকে বলে হে ইয়াহুদী বা হে নাসারা (খৃষ্টান) বা হে মাজুসী (অগ্নীপুজক) আরে সে ডাকে সাড়া দেয় তবে সে কাফির হবে। একইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি বলে

আমি খোদাদ্রোহী তবে সেও কাফির হবে। [বাহরুর রায়েক]

ইবনে হাযার হায়তামী বলেন,

ولو قال فلان كافر هو هو اكفر مني كان كافرا اقرارا بالكفر

যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি কাফির। সে আমার চেয়ে বেশি কাফির তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে যেহেতু সে নিজের কুফরী স্বীকার করছে। [ই'লাম]

ইমাম নাব্বী বলেন,

ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضرباً شديداً فقال رجل لست بمسلم فقال لا متعمداً كفر

যদি কেউ রাগান্বিও হয়ে তার সন্তান বা দাসকে প্রহার করে এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি কি মুসলিম

নও? সে ইচ্ছাকৃতভাবে বলে না তবে সে কাফির হবে। [রওদাতুত্ তালেবীন]

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এসেছে,

واذا عزم الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال

যদি কেউ ১০০ বছর পরে কুফরী করার সংকল্প করে তবে সে এখনই কাফির হবে।

একই কথা ইমাম নাব্বী আর-রাওদাতে উল্লেখ করেছেন।

দুররে মুখতারে বলা হয়েছে,

إن كان كذا غدا فأنا أكفر فإنه يكفر من ساعته

যদি কেউ বলে আগমী কাল এমন কিছু ঘটলে আমি কাফির হয়ে যাবো তবে সে এখনই কাফের হয়ে যাবে।

গ) অন্য কাউকে কুফরী করার পরামর্শ

দেওয়া, কুফরী কাজ করতে উৎসাহিত করা, কুফরী করতে সহযোগিতা করা, কুফরী করার আদেশ প্রদান করা বা কুফরী করতে বাধ্য করা কুফরী। যে এগুলো করবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

বাহরুর রায়েকে এসেছে,

ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو علي وجه اللعب

কুফরী কালিমা যে পাঠ করতে চায় তাকে তা শিক্ষা দিলে একজন মুসলিম কাফির হবে। যদিও এটা হাসি তামাশার ছলে হয়।

রুদ্দুল মুহতারে ইমাম কারাফী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে,

لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنْ الْكَنَائِسِ ، وَأَنَّ مَنْ سَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ رَاضٍ بِالْكُفْرِ وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ

যে সকল গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেগুলো

পুনর্নির্মাণ করা যাবে না। সে ব্যক্তি ওগুলো পুনর্নির্মানে সহযোগিতা করবে সে কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করছে বলে গণ্য হবে আর কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ইবনে জারীর তবারী হতে বর্ণনা করেন,

مَنْ يُصَوِّرُ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ عَارِفٌ بِذَلِكَ قَاصِدًا لَهُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ

যে কেউ জেনে শুনে এবং স্বেচ্ছায় এমন মূর্তি বা ছবি নির্মাণ করে আল্লাহর পরিবর্তে যার পূর্জা করা হয় তবে সে কাফির হবে । [ফাতহুল বারী]

ইমাম নাব্বী বর্ণনা করেন,

ولو أكره مسلماً على الكفر صار المكره كافراً

যদি কেউ কোনো মুসলিমকে কাফির হতে

বাধ্য করে তবে সে কাফির হবে। [রাওদা]

কাউকে কুফরী কাজের উপর টিকে থাকা বা কুফরীর দিকে ইশারা ইঙ্গিতে হলেও আহ্বান করা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম ভীষণ কড়াকড়ি করেছেন। হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে এ বিষয়ক বেশ কিছু ফতোয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

মোল্লাহ আলী ক্বারী আল হানাফী বলেন,

وفي الفتاوي الصغري اسلم كافر فقال لـه مسلم لو لم تسلم حتي ترفع ميراثا أي تأخذه كفر أي المسلم القائل

ফতোয়ায়ে সুগরাতে আছে একজন কাফির মুসলিম হলে অন্য একজন মুসলিম তাকে বলল তুমি যদি মিরাছের সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। যে মুসলিম একথা বলল সে কাফির হবে। [শারহে ফিকহে আকবার/২৭২]

ইমাম নাব্বী আর-রাওদাতে হানাফী ওলামায়ে কিরাম থেকে উল্লেখ করেন,

قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرض علي الاسلام فقال حتي أري أو اصبر إلي الغد أو طلب عرض الاسلام من واعظ فقال اجلس إلي آخر المجلس كفر

তারা [হানাফী আলেমরা] বলেন, যদি কোনো কাফির কোনো মুসলিমকে বলে আমাকে ইসলামের দীক্ষা দেন আর সে বলে আমাকে একটু চিন্তা করার সুযোগ দিন বা আগামী কাল পর্যন্ত সবর করুন। অথবা কোনো কাফির যদি কোনো বক্তার মজলিসে উপস্থিত হয়ে বলে ইসলামের দীক্ষা চায় আর উক্ত বক্তা বলে সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তবে সে কাফির হবে।

ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এই ফতোয়াটি উল্লেখের পর বলেন,

لانه امر بالبقاء في الكفر ساعة

কেননা সে কিছু সময়ের জন্য হলেও উক্ত কাফিরকে কুফরীর উপর টিকে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

বর্তমানে কিছু নেতা-নেত্রীকে দেখা যায় কেউ হিন্দু থেকে মুসলিম হলে তাকে নিজ ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য হুমকি থামকি দেয় বা অত্যাচার নির্যাতন করে। যে এমনটি করে সে কাফির হয়ে যাবে যেহেতু সে অন্যকে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দিচ্ছে।

ঘ) কাফিরদের উৎসবে গমণ করা এবং তাদের সাথে উৎসব আমেজে মেতে ওঠা এবং তাদের উৎসব উপলক্ষে হাদীয়া আদান প্রদান করা কুফরী হিসাবে গণ্য।

হানাফী মাযহাবের ফিকাহ গ্রন্থসমূহতে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

لو أن رجلا عبد خمسين سنة ثم أهدي لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله

যদি কোনো ব্যক্তি ৫০ বছর ইবাদত করে এর পর নওরোজের দিন (মাজুসীদের উৎসবের দিন) কোনো মুশরিককে একটি ডিম উপহার দেয়। যদি সে উক্ত দিনের সম্মানের কারণে এমনটি করে তবে সে কাফির হবে এবং তার সকল ইবাদত নষ্ট হবে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুখতার ইত্যাদি]

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে কি কাজ করলে একজন ব্যক্তি কাফির হয় সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وبخروجه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما

এবং (কোনো মুসিলম কাফির হবে) যদি সে মাজুসীদের ধর্মীয় উৎসবের দিন তাদের সাথে গমণ করে এবং তারা ঐদিন যা করে তা করে অথবা ঐ দিনের সম্মানে এমন কিছু ক্রয় করে যা সে পূর্বে ক্রয় করতো না।

কাজী ইয়াদ বলেন,

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعى إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤس فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام

আমরা এমন প্রত্যেক ব্যাক্তিকে কাফির বলব যে এমন কাজ করে যে কাজের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা যে, তার কেবলমাত্র

কাফিরের মাধ্যমেই হতে পারে যদিও উক্ত ব্যাক্তি উক্ত কাজ করার পরও প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করে যেমন মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, ক্রুশ ইত্যাদিকে সাজদা করা, **ইয়াহুদী বা খৃষ্টানদের সাথে তাদের উপাসনালয়ে গমন করা তাদের পোশাক পরিধান করা খৃষ্টানদের ফিতা গলায় পরা এবং তাদের অনুসরনে মাথার চুল পাখির বাসার মতো জাড়ানো ইত্যাদি।** কেননা মুসলিমরা ইজমা করেছেন যে এসব কাজ কেবল একজন কাফিরই করতে পারে এবং এসব কাজ কুফরীর আলামত যদিও এসব কাজে লিপ্ত ব্যাক্তি প্রকাশ্যে ইসলামের অনুসরণ করে। [আশ শিফা]

সুতরাং যেসকল মুসলিম নামধারী

ধর্মনিরোপেক্ষ শাসক, পরমত সহিষ্ণুতা ও অসাম্প্রদায়িকতার মূলমন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে কাফির-মুশরিকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের সাধুবাদ জানিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে বা তাদের ধর্মীয় উপসনালয়ে গমণ করে ও তাদের উপহার প্রদান করে তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত।

বিঃদ্রঃ উপরে আমরা বেশ কিছু কুফরী কথা ও কাজের বর্ণনা দিলাম। যে কেউ এসব কথা বা কাজে লিপ্ত হয় সে কাফির হবে। তবে লক্ষ করতে হবে সে এসব বিষয়ে অজ্ঞ কিনা বা বাধ্য করে এসব কাজ করছে কিনা। যেহেতু কুফরী কাজ করার পরও অনেক সময় অজ্ঞতা বা বাধ্যতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হয় এবং তাকে কাফির হিসাবে ঘোষণা করা যায় না। অতএব উপরের কার্যকলাপগুলো

সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিজে সেগুলো পরিহার করে চলতে হবে তবে অন্য কারো উপর কুফরীর ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

সুন্নাত ও বিদয়াত

সুন্নাত অর্থ পথ, পন্থা পদ্ধতি ইত্যাদি। রসুলুল্লাহ (সঃ) নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে কোনো আমল কিভাবে করা হবে সে পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। রসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সেটিই তার সুন্নাত। যদিও বর্তমানে আমরা সুন্নাত বলতে বুঝি ফরজ নয় এমন আমলসমূহ কিন্তু এটি আসলে ফিকহী পরিভাষা। মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় সুন্নাত বলতে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাগ্রিক কর্মকান্ডকে বোঝায় তা ফরজ, ওয়াজিব বা

নফল যাই হোক না কেনো। সুন্নাতের বিপরীত হলো বিদয়াত। কুরআন-হাদীসে কোনো বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার বিপরীত ধারণাকে ইসলাম সম্মত মনে করাই মূলত বিদয়াত। মোট কথা ইসলামের নামে ভূল আক্বীদা বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তারাই বিদয়াতী। যারা ইসলামের নামে বিভিন্ন ভুল ধারণার উৎপত্তি ঘটায় তারা কিছু আয়াত বা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে ফলে অনেকের পক্ষে কোনটি সঠিক বিশ্বাস আর কোনটি ভুল বিশ্বাস সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া সম্ভব হয় না। একারণে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবারা এবং তাদের পরবর্তী যুগের বরেণ্য ওলামাদে দ্বীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যেমন চার মাযহাবের ইমামগণ ও তাদের সমসাময়িক গ্রহণযোগ্য ওলামায়ে কিরামগণ কোনো বিষয়ে কি ব্যাখ্যা

দিয়েছেন। সকল বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই সঠিক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে যেহেতু রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বত্তোম হলো আমার সাহাবারা এরপর তাদের পরবর্তী যুগ তার পর তাদের পরবর্তী যুগ। [বুখারী]

তিনি আরো বলেছেন,

لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

তোমাদের উপর যে যুগই আসবে তার পরবর্তী যুগ আরো খারাপ হবে। [বুখারী]

এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,

لَسْتُ أَعْنِي رَخَاءً مِنَ الْعَيْشِ يُصِيبُهُ وَلَا مَالًا يُفِيدُهُ وَلَكِن لَا يَأْتِي عَلَيْكُم يَوْم الا وَهُوَ أَقَلُّ عِلْمًا مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ

আমি শান্তি শৃঙ্খলা বা সম্পদের প্রাচুর্যতার দিক থেকে কম বেশি হওয়া বুঝাচ্ছি না বরং তোমাদের উপর যে যুগই অতিক্রম করবে তার পরের যুগ আগের যুগের তুলনায় জ্ঞানের দিক থেকে কম হবে। [ফাতহুল বারী]

রসুলুল্লাহ (সঃ) এর সত্য সাক্ষ্য অনুযায়ী এটা স্পষ্ট প্রমানিত যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীন ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সুতরাং যে কোনো বিষয়ে তাদের মাতাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। যদি কেউ সাহাবায়ে কিরামের মতামত পরিত্যাগ করে খেয়াল-খুশি মত কয়েকটি আয়াত বা গুটিকয়েক হাদীস নিজের মতের স্বপক্ষে ব্যবহার করে এমন চিন্তাদর্শন আবিষ্কার করে যা সত্যপন্থী ওলামায়ে দ্বীন তথা আহলুস্

সুন্নাহ ওয়াল জামায়ার আক্বীদা বিরুদ্ধ তবে উক্ত ব্যক্তি বিদয়াতী হিসাবে গণ্য হবে এবং তার সংস্রব পরিত্যাজ্য হবে। ইবনে হাযার আসক্বালানী বিদয়াতীর ব্যাখ্যায় বলেন,

وَالْمُبْتَدِعُ أَيْ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئًا مِمَّا يُخَالِفُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

বিদয়াতী সেই ব্যক্তি যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়ার আক্বীদার সাথে বৈপরিত্বমূলক আক্বীদা রাখে। [ফাতহুল বারী]

সকল মুসলিমরা একমত যে, খারেজী, মু'তাজিলা, ক্বাদরীয়া, মুরজিয়া, মুজাসসিমা ইত্যাদি ফিরকা বিদয়াতী হিসাবে গণ্য যেহেতু তারা ইসলাম সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের মতামত পরিত্যাগ করে নিজেরা কিছু ভ্রষ্ট মতবাদ জন্ম দিয়েছিল। খারেজীরা কবীরা গোনাহে

লিপ্ত হলে কোনো মুসলিমকে কাফির বলতো, মুরজিয়া ও ক্বাদরিয়ারা তাকদীরে বিশ্বাস করতো না, মুজাসসিমারা আল্লাহকে সৃষ্টির মতো আকৃতি বিশিষ্ট মনে করতো ইত্যাদি। সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে বৈপরিত্বমূলক এসব আক্বীদাই মূলত বিদয়াত এবং এগুলো যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের বলা হবে বিদয়াতী।

বর্তমানে একদল লোক আছে যারা বিদয়াত বলতে কেবল নামাযের পর মুনাজাত করা, মুখে নিয়ত করা, জোরে যিকির করা সুর করে আল্লাহুম্মা সল্লি আলা বা ইয়া নবী সালামু আলাইকা পাঠ করা ইত্যাদি বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে। এরা বড় বড় বিদয়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল।

প্রকৃত কথা হলো, উপরে বর্ণিত খারেজী, মুরজিয়া, কদ্বরীয়া ইত্যাদি বিদয়াতী

ফিরকাদের মতোই ভয়ংকর আক্বীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোক বর্তমানেও আছে। উদাহরণ সরুপ কিছু লোক মনে করে মুসলমানদের উচিৎ বিধর্মীদের ধর্মীয় গ্রন্থ ও উপাস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। একারণে তারা বিধর্মীদের ধর্মীয় গ্রন্থকে সর্বদা পবিত্র গীতা, পবিত্র বেদ এবাবে সম্মোধন করে থাকে। একইভাবে তারা আল্লাহকে হিন্দুয়ানী পরিভাষায় ব্রক্ষ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে ডাকা যায় বলে মনে করে এবং নিজেকে ও ইন্ডিয়ায় বসবাসকারী সকল মুসলিমকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে হিন্দু প্রমান করার চেষ্টা করে। জান্নাতে মেয়েদের জন্য পুরুষ হুর আছে বলে ফতোয়া দেয়। এর চেয়ে উদ্ভট ও বিদয়াতী আক্বীদা-বিশ্বাস আর কি হতে পারে।

হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে ইসলাম ত্যাগ করে তাকে হত্যা করো।
[বুখারী]

এই হাদীসের আলোকে সকল আলেমদের ইজমা এই যে, একবার মুসলিম হওয়ার পর যে কাফির হয়ে যায় তথা মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।

বর্তমানে কিছু লোক প্রচার করছে মুরতাদকে হত্যা না করে হাত পা কেটে দেওয়া, দেশত্যাগে বাধ্য করা বা এমনকি ছেড়েও দেওয়া যেতে পারে। এটাও স্পষ্ট বিদয়াতী আক্বীদা।

হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে এবং ওলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, যদি কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কাফির হয় তবে তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব তার আনুগত্য করা

বৈধ নয়। কিছু লোক বলছে এমনকি ভারত বা ব্রিটেনের মতো কাফির ও ইসলাম বিদ্বেশী সরকারের আনুগত্য করাও মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য। এটাও বিদয়াত।

সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতে এবং বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে কাফিরদের উপর আগে আক্রমণ করে জিজিয়া কর আদায় করতে হবে। কিছু লোক বলে ইসলাম আগে আক্রমণ করে না কেবল আক্রান্ত হলে তার প্রতিবাদ করে। এটাও সকল আলেমদের মতের বিরুদ্ধে একটি বিদয়াতী মত।

আল্লাহ (সুবঃ) মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন তার বিধান অনুযায়ী পৃথিবীকে পরিচালিত করার জন্য। রসুলূল্লাহ (সঃ) নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধীকার করে ইসলামী বিধান মোতাবেক তা পরিচালনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীনকে

ব্যক্তিজীবন, রাষ্ট্র এবং সামাজ সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করার নির্দেশ দিয়েছেন। এসবের পরও যারা মনে করে ইসলামে রাজনীতি বলে কিছু নেই কেবল মসজিদে গিয়ে নামায পড়া ছাড়া আর কোনো কাম-কাজ করার প্রয়োজন নেই তারাও বিদয়াতী।

একইভাবে যারা কাফির-মুশরিকদের মস্তিষ্কপুসূত চিন্তা-দর্শন সমাজতন্ত্র বা গণতন্তকে ইসলামীকরণের মাধ্যমে ইসলামী গণতন্ত্র জাতীয় কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে তারাও বিদয়াতী কর্মকান্ডে লিপ্ত। কারণ এর মাধ্যমে ইসলামের সঠিক রাষ্ট্র দর্শন বিকৃত ও পরিত্যাক্ত হয়। [২]

---

[২] ইসলামের সঠিক রাষ্ট্র দর্শনকে বলা হয় খেলাফত (خلافة) । হাদীস শরীফে স্বয়ং রসুলূল্লাহ (সঃ) এই নামটি ব্যবহার করেছেন। খিলাফত শিরোনামে বিভিন্ন

হাদীস গ্রন্থ পৃথক অধ্যায়ও রয়েছে। যেখানে এ বিষয়ক যাবতীয় মূলনীতি বর্ণিত রয়েছে। গণতন্ত্রের সাথে খেলাফতের মৌলিক পার্থক্য গুলো নিম্নরুপ,

১. গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেশিরভাগ লোক যাকে সমর্থন করে সেই শাসক হিসাবে মনোনিত হয়। তার স্বভাব চরিত্র আমল আখলাক বিবেচ্য বিষয় নয়। ইসলামী খেলাফত এর সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করে। এখানে কেবলমাত্র নেককার লোক শাসক হিসাবে মনোনিত হয় তার পক্ষে জনসমর্থন থাক বা না থাক। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে যদি কেউ জোরপূর্বক ক্ষমতায় আহরণ করে কিন্তু ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করে তবে তার আনুগত্ব করা আবশ্যক হবে। এ বিষয়ে হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে একজন শাসক যতই ন্যায় পরায়ন ও সৎ লোক হোক তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর (যেমন পাঁচ

বছর) জোরপূর্বক ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং জনগণের ভোটের মাধ্যমে আরেকজন পাপাচারী ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ইসলামী পদ্ধতিতে একজন ন্যায়পরায়ন শাসককে পদত্যাগ করার দাবী উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ হারাম। যে কেউ ন্যায় পরায়ন খলীফার পদত্যাগ দাবী করে রসুলুল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

এই উম্মাত কোন একজন নেতার আনুগত্যে একত্রিত থাকা অবস্থায় যদি কেউ বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তাকে তরাবারী দ্বারা আঘাত করো। সে যেই হোক না কেন। [সহীহ বুখারী]

সুতরাং যারা প্রতি পাঁচ বছর পর পর খলীফাতে পদত্যাগ করার কথা বলে তাদের কয়বার হত্যা করা উচিত তা ভেবে দেখা দরাকার।

সত্য কথা হলো, এই সব বড় বড় বিদয়াত নিয়ে চিন্তা করলে যিকির করা, বা দরুদ পড়ার বিদয়াত সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। এর পরও যারা বিদয়াত বলতে কেবল, এইসব ছোটখাটো

---

৩. গণতান্ত্রিক পন্থায় বেশিরভাগ ভোট পেলে নারী পুরুষ যে কেউ শাসক হতে পারে কিন্তু ইসলামে বেশিরভাগ ভোট পেলেও নারী শাসক হতে পারবে না বরং শাসক হবে পুরুষ। একইভাবে হাদীসে কুরাইশ বংশের লোককে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন করতে বলা হয়েছে সুতরাং সাধারান অবস্থায় অকুরাইশী ব্যক্তি খলিফা হতে পারবে না।

এছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যাতে ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার 'ভেজালে মেশাল' নামক গ্রন্থটি অধ্যায়নের অনুরোধ করছি।

বিষয়কে বুঝিয়ে থাকেন এবং সেগুলোর পিছনে লেগে মুসলিমদের বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার চেষ্টা করেন এরাও মূলত বিদয়াতী কারণ এরা বিদয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারিনি।

মুসলিম হিসাবে আমাদের উচিৎ ইসলামের বিপরীত বাতিল চিন্তা-দর্শন উৎখাতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং সে লক্ষে ছোট-খাটো ও মতভেদপূর্ণ বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করা।

প্রাপ্তি স্থানঃ মুসলিম ফটোস্ট্যাট এ্যান্ড কম্পিউটিং, দর্শনা (রেলবাজার), চুয়াডাঙ্গা।
০১৯৩১৪৪১২১৪,